–অবসর–

''পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে'' –– লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

অবশ্য যখন লিখেছেন তখন তিনি ঘোর রোম্যান্টিক, তখন বিনা তপস্বিনী তিনি যে তাপস হতে রাজী নন, জোর গলায় একথা বলেন। মনু শাস্ত্রের এই সব অনুশাসন মাথায় রেখে তখন তাঁর বক্তব্য এই যে বনে যেতে হলে যৌবনেই যাওয়া ভালো, বনের যা মধু, যৌবনেই তার স্বাদ পাওয়া যায় ভালো করে, তাছাড়া বন নিরিবিলি, সেখানে দুচারটে মনের কথা বলার সুযোগও আছে। ইত্যাদি।

এসব নিছকই প্রগল্‌ভতা। মনুসংহিতা কিন্তু বানপ্রস্থধর্মের কথা বেশ খোলসা করে লিখেছেন, যদিও পঞ্চাশ বছরেই তা করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মোটামুটি চুল পেকে, চামড়া কুঁচকে, নাতি–নাতনী হয়ে গেলে বানপ্রস্থ যাওয়ার দরকার, এটা বলেছেন। তবে বনেই যে যেতে হবে এ বিধানটা একেবারে ঠিক। গিন্নিকে ছেলে–বৌয়ের ঘাড়ে চাপানো যেতে পারে, আর তেমন নাছোড়বান্দা হলে সঙ্গে নেওয়া চলতে পারে। তারপর, মনুর যথা রীতি সেইমতো কী খাবে, কী পরবে, কী করবে –– এসবের বিশদ নির্দেশ দেওয়া আছে। মনুর মতে বানপ্রস্থ হোলো মানুষের চার আশ্রমের মধ্যে তৃতীয় আশ্রম, এই আশ্রমের ধকল সহ্য করে বেঁচে থাকলে আরেকটি আছে, তার নাম সন্ন্যাস বা যতি। যদিও বানপ্রস্থ আশ্রম ব্যাপারে মনুর নির্দেশ পড়ে মনে হয়না খুব বেশী লোক এই ফাঁড়া পার হতে পারতেন। চুলদাড়িনখ রাখার ব্যাপার তো আছেই, গাছের তলায় ভূমিশয্যা, ঘনঘন উপবাসের বিধান আছে, যদিও বুনো চাল আর মাটিতে পড়া ফল আহার করার যা ফিরিস্তি আছে তাতে উপবাস করাটা খুব একটা খারাপ লাগবে না। এতেই শেষ নয়, আরো সাঙ্ঘাতিক সব বিধান –– এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, অর্থাৎ চারদিকে আগুন জ্বেলে, দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে তপস্যা করা, বর্ষায় ছত্রহীন হয়ে ভেজা এবং হেমন্তে ভিজে জামা গায়ে ঘুরে বেড়ানো। ব্রাহ্মণদের আবার এর ওপরে সারাদিন ধরে বেদ পড়ার শাস্তিও আছে। এততেও যদি মরণ না হয় তাহলে যতিরাশ্রম, তার কথা শুধু চিন্তা করেই ইহলীলা সংবরণ করা যায়, এসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। মনু অবশ্য কোনো কিছুরই কারণ দর্শানোর ব্যাপারে বিশেষ উদাসীন, ভাবটা অনেকটা ''যা বলছি তাই করো, জ্যাঠামি কোরো না'', বানপ্রস্থের ব্যাপারেও তাই। অর্থাৎ বানপ্রস্থে যাবে, এই এই করবে, কেন যাবে, কেন করবে, সেসব জাহাজের খবরে তোমার কী কাজ বাপু। নচিকেতার মতো ছিনে জোঁক হলে বলতেন মোক্ষলাভ হবে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে মনুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধি নিবারণ। খানিকটা ম্যালথাসিয়ান চিন্তা বলতে পারেন, এসব দার্শনিক ব্যাপারে আমরা তো বরাবরই পাশ্চাত্যের অগ্রণী। সেকালে দীর্ঘজীবী হওয়ার কয়েকটা অন্তরায় ছিলো মানতেই হবে, যথা রাক্ষস–খোক্কস, বদমেজাজী মুনিঋষি, দেবতারাও থেকে থেকেই বাম হয়ে বসে থাকতেন, সাপ–খোপও ছিলো। কিন্তু আবার বেঁচে থাকতে সহায়তা করার উপায়ও কম ছিলো না। খাবারে ভেজাল নেই, বাতাসে নেই দূষণ, গাড়ীই নেই তো গাড়ীর দুর্ঘটনা, এমনকী ক্যানসার–ট্যানসার কতো রোগের কথা আজকাল শুনি সেসব কিছু ছিলো না। সেকালে তো শুধু সেই বায়ু–পিত্ত–কফ

তাও মকরধ্বজ আর চ্যবনপ্রাশের গুণে তারাও খুব জুৎ করতে পারতো না, ভেজাল ছিলোনা তো। কী দূরদৃষ্টি, বানপ্রস্থ মারফৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে এতোদিনে মানুষের ভারে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই টুপ করে ভারত মহাসাগরে ডুবে যেতো।

তা ক্ষণিকা লেখার তিরিশ বছর পরে সাবালক রবীন্দ্রনাথ ''পঞ্চাশোর্ধ্বম্'' বলে আর এক প্রবন্ধে আসল কথাটা খুলে লিখলেন। মানুষের জীবনে কিছুকাল শক্তির বর্ধন, তারপর হ্রাস। ঐ সন্ধিক্ষণেই কাজে যতি দেওয়া, 'ক্ষ্যামা' দেওয়া বিধেয়, নচেৎ জীবনের ছন্দোপতন হয়। 'ছন্দোপতন' -- একজন কবির কাছ থেকে আর কী আশা করেন। কবি কিন্তু অতি বিচক্ষণ, বলছেন সেই বনই বা আর কোথায়, তাছাড়া বনবাসী হতে গেলেই লোকে গোলমাল করে, 'যাও কোথায় এরই মধ্যে'। আরো বলছেন জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর যায় কাঁচা হাতকে পাকাতে, পরের পঁচিশ বছর পূর্ণশক্তিতে কাজ করা এবং শেষের পঁচিশ বছর সেই কাজের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার সাধনা। অর্থাৎ দুম করে নয়, যাকে বলে 'কোল্ড টার্কি', আস্তে ধীরে, রইয়ে সইয়ে। বলছেন যে সংসারের দাবী কেবল ঐ মাঝের পঁচিশটিতে, আগেও নয়, পরেও নয়। পঞ্চাশকে কবি টেনে পঁচাত্তরে এনেছেন, সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব, তিনি সত্তরে 'শেষের কবিতা' লেখেন, হাজারখানেক ছবি আঁকেন, তাঁর কথাই আলাদা। আটঘাট অবশ্য বেঁধে রেখেছেন ঐ সূক্ষ্ম যুক্তি, 'ফাইন প্রিন্ট'এ -- পঞ্চাশোর্ধ্ব যা কৃতি, সংসারের তার ওপর কোনো দাবী নেই এই কথাটি জানিয়ে। তারপর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায়, তা সাহিত্যিকগ্রাহ্য, আমাদের মতো আদার ব্যাপারীদের নয়। ভুলে যাবার আগে জানাই তিনি আরেকটা মারাত্মক কথা বলেছেন, 'কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান'। মনে রাখার মতো কথা; সত্যদ্রষ্টা লোক!

ঠিক আছে, পঞ্চাশ আর পঁচাত্তরের মাঝামাঝি পঁয়ষট্টিতেই রফা হোক। মার্কিন সরকার অবশ্য উনিশশো উনচল্লিশের পর থেকে এই বয়সটিকে বছরে চার মাস করে ঠেলে তুলছেন তবে তার উদ্দেশ্য আমাদের আলোচ্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্তরের দশকে ড্যানিয়েল লেভিনসন নামে এক মনস্তাত্ত্বিক পুরুষের জীবনের ক্রমপর্যায় নিয়ে কিছু সাড়া-জাগানো গবেষণা প্রকাশ করেন, গেইল শিহি নামে এক ভদ্রমহিলা সহজবোধ্য এবং অসাধারণ জনপ্রিয় এক বইও লেখেন তার ওপরে, নাম 'প্যাসেজেস'। পুরুষের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য, এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন লেভিনসন , প্রতিটির দৈর্ঘ্য কমবেশী কুড়ি বছর। আদ্যপর্বের শুরু বাইশ বছরে, কৈশোরের সুরক্ষিত গণ্ডী পেরিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের পৃথিবীতে প্রথম পদক্ষেপ। তার পরের আঠারো বছর, অর্থাৎ চল্লিশ পর্যন্ত কাটে সেই পৃথিবীতে নিজের কোনো একটা স্থান করে নেওয়াতে, জীবনকে একটা অবয়ব দেওয়ার চেষ্টায় -- কাজ, প্রেম, পরিবার, বন্ধু আর সহকর্মীগোষ্ঠী, সবাইকে জড়িয়ে। যখন আদ্যপর্বের শুরু তখন প্রাণশক্তি প্রচুর, 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য', মনে প্রশ্ন বহু আর তার ওপর ভিত্তি করে সৃজনকর্ম বাধাহীন। চল্লিশে পৌঁছবার পথে আমরা কিছু ঢেউ খেয়েছি, সংসার সম্পর্কে আমাদের একরৈখিক ধারণা টোল খেয়েছে। জেনেছি সংসার খুব সুবিধের জায়গা নয়, জেনেছি অনেক কিছুতেই গোলমাল আছে এবং আমাদের পূর্বসূরীদের অকর্মণ্যতাই এই গোলমালের মূল।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে যখন আদিপর্বকে বিদায় দিয়ে আমাদের মধ্যপর্বে প্রবেশ করার পালা তখন দেখছি আমরা প্রাণশক্তির বিনিময়ে পেয়েছি প্রভাব, traded power for influencel ছোটো কিংবা প্রমাণ সাইজের দুয়েকটা ঘটনা আমাদের জীবন একেবারে এলোমেলো না করে দিলেও কিছু হেরফের ঘটিয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমরা দেখেছি, আমাদের জীবনে তার ছায়া পড়েছে,

হয়তো বা নিকটতম পরিবারের কারুকে নিয়ে গেছে, বাবা বা মা, আদরের পিসি। মৃত্যুভয়ে ভীত নয় আমরা, কিন্তু আমাদের চেতনার পরিধিতে তার আনাগোনা, সে কথা আমরা বুঝতে পারছি। আরো বুঝতে পারছি দশ বছর আগে ঐ যাদের অকর্মণ্যতায় সংসারের এই দুর্দশা বলে আমরা জেনেছি, আজ দেখছি আমরাই তারা। সংসারের কর্তৃত্ব এসে পৌঁচেছে আমাদের হাতে, ভালো বা মন্দ তা নির্ভর করছে আমরা কী করলাম বা না করলাম তারই ওপর। আমাদের যা কিছু করার আছে, সংসারকে দেবার আছে, তা করার সময় এসেছে এবং সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে -- এই চিন্তার মোকাবেলা করাতেই মাঝবয়সের সঙ্কট, mid-life crisis আর সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণচেষ্টা আমাদের এই মধ্যপর্বকে দেয় এক নতুন গৌরব। পরের পনেরো বছর, অর্থাৎ প্রায় ষাট বছর অবধি আমরা ঘুরি এরই ঘোরে। আদিপর্বের সেই তীক্ষ্ণ সৃজনী হয়তো আর ফিরে আসেনা কিন্তু আমরা ভাবনাকে রূপায়িত করায় কুশলী হয়ে উঠি। এই পর্বটির ওপরেই সংসারের দাবী আছে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন ।

আদিপর্বের অন্তে আত্মবিশ্লেষণের শেষে শুরু হয়ে কুড়ি বছর মতো, অর্থাৎ ষাট অবধি চলে আমাদের জীবনের এই মধ্যগগন অয়ন। 'বড়োরা বলছেন আমার এই করাই উচিত' থেকে 'আমি চাই', তার থেকে 'আমাকে করতেই হবে' -- I should, I want and I must| চলিত কথায় বলতে গেলে প্রাক্‌আদি, আদি আর মধ্যপর্বের এই মন্ত্র। মধ্যগগনে অবস্থান খুব সহজ নয়, ঘাতপ্রতিঘাত আসে নানা, অনেকটাই শরীর নিয়ে, তাছাড়া সামাজিক, পারিবারিক এবং কর্মক্ষেত্রে। সেসব আমরা পেরিয়ে আসি অনেকেই,তবে তার মাশুল দিতে হয় বৈকী। পঞ্চান্ন থেকে ষাটে পৌঁছবার পথে আমরা দেখি, আমরা কিছু পেয়েছি, কী পেয়েছি তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, হারিয়েছি যে অনেক কিছু, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। ছেলেমেয়ে চলে গেছে, নীড় শূন্য, দেহ সব দাবীতে আগের মতো চট্‌জলদি সাড়া দেয়না, পঞ্চাশ–পঞ্চান্নতে যে বিশাল প্রভাবের গণ্ডী রচনা করেছিলাম, তা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। আমরা এও জানি যে সংখ্যাতাত্ত্বিকদের হিসেব মেনে নিলে আরো বছর বিশেক আমাদের থাকতে হতে পারে। প্রশ্ন আসে, আমাদের জীবনের শেষ খতিয়ান কী দাঁড়ালো, কী দাঁড়াবে? অমরত্ব লাভ যে হবে না, আদিপর্বের সে স্বপ্ন আমাদের গেছে তবে আমরা চলে গেলে অন্তত কিছুদিন লোকে আমাদের কী ভাবে স্মরণে রাখবে, আদৌ রাখবে কীনা, এ ভাবনাটা আসতেই থাকে। সবচেয়ে বড়ো ভয় যে আমরা কী জঞ্জাল হয়ে যাবো, বরবাদ হয়ে যাবো একেবারে। 'রিটায়ার' কথাটাই অমনি, ফেলে দেওয়া, পেছিয়ে আসা, শুতে যাওয়া, যার মধ্যে কর্মশেষ, দিনশেষ, অর্থাৎ একটা 'শেষ'এর ব্যঞ্জনা আছে। খুব সহজ চিন্তা নয়, নয় সুখকর।

ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হোলো এই প্রশ্নের মোকাবেলা করে অন্ত্যপর্বের জন্য নিজেকে তৈরী করা। কীভাবে তা করা উচিত? আমার পাড়ারই লাইব্রেরীতে দেখছি কমপক্ষে পঞ্চাশটা বই আছে হাতুড়ে থেকে বিশারদদের উপদেশে বোঝাই। নানা মুনির নানা মত, তার ভালোমন্দ বিচার করে সঠিক পথটি বার করতেই দশ পনেরো বছর কাটিয়ে দেওয়া যায়। উল্‌টে পাল্‌টে দেখে মনে হয় মনুসংহিতার কাল হলেই ভালো ছিলো, সারাদিন খুঁটে খুঁটে ফলপাকুড় কুড়িয়ে, বনের বাঘভাল্লুক তাড়িয়ে এবং মনুর শপাঁচেক হ্যান করো ত্যান করো, এটা কোরোনা, ওটা কোরোনা, এর হিসেব রেখে দিব্যি সময় কেটে যেতো, আর আখেরটাও ভালো, হয় মোক্ষ নয় অক্ষয় স্বর্গবাস। তবে আজকের মনুরা দুয়েকটা ব্যাপারে মোটামুটি একমত দেখা যাচ্ছে। প্রথম হোলো শরীরের যত্ন নাও। আর দ্বিতীয় হোলো, কিছু একটা করো,কিছু না করার অবশ্যম্ভাবী ফল বিষণ্ণতা রোগ, ডিপ্রেশন, সেটা শারীরিক বা মানসিক, কোন স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভালো নয়।

প্রথমটার সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই, যদিও দেহযন্ত্রের 'স্পেয়ার পার্ট্স্'-এর দোকান থাকলে ভালো হোতো। হয়তো কখনও তা হবে, আমাদের জীবদ্দশায় নয়। গীতায় 'বাসাংসি জীর্ণানি' পড়ে আশা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য আগে মরতে হবে, তারপর পুনর্জন্ম, সে ভারী কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে যোগ বা বিয়োগ যাই করি না কেন, দেহযন্ত্র আর 'ফ্যাক্টরি ফিনিশড্' হবে না, ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। বুক ধড়ফড়, চোখের ছানি, রাত্রে ওঠা, অগ্নিমান্দ্য -- ওগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে শিখতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টাই ভাবিয়ে তোলে। হাতুড়েদের বইপত্তর সুভাষিতের ভাণ্ডার। 'অবসর নয়, পুনর্যোজনা', do not retire, redirect, পুনর্নবীকরণ, renewal| বিলক্ষণ। ষাট বছর বয়সের একটা কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশটা ভালো লেগেছিলো, সেটা হোলো, শোভনভাবে বুড়ো হতে শেখা, growing old gracefullyl এটা উড়িয়ে দেবার কথা নয়; বুড়ো যখন হতেই হবে তখন সুরুচির সঙ্গে তা ঘটানোই ভালও। বুড়ো বয়সে বিরক্ত হবার মতো ঘটনা প্রচুর, খিট্খিটে বুড়ো বদনাম এড়াতে গেলে দস্তুরমতো চেষ্টা করতে হবে। সংসারের রাশ ছাড়তে হবে, ছেলেছোকরাদের অনিবার্য অধঃপতন মেনে নিতে হবে, কিছুই যখন মনোমতো হচ্ছে না তখন মনকেই বশে রাখতে হবে। আমার মামা চুরাশিতেও সদানন্দ, পঁচিশ বছর আগে, নাতি হবার পর তিনি স্থির করেছিলেন যে সংসারে কোথাও, কোনো ব্যাপারে, কারুর সঙ্গে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেই নিজেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে আনবেন, পঁচিশ বছরের অভ্যাসে সে ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন।

জীবনের আর সব কিছুই যেমন, বুড়ো হওয়াটাও তেমনই, অবিমিশ্র মন্দ তা নয়। কিছু কিছু উপসর্গ ভালোই লাগে। যৌবনের অস্থিরতা নেই, ফেনোচ্ছলতা নেই, মোটামুটি অনেক কিছু মেনে নিতে শিখেছি, মানুষের ওপর আস্থা একেবারে তলানিতে পৌঁছোয় নি। কোল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে, পারমাণবিক ধ্বংস ঠেকিয়ে রাখা গেছে, মুদ্রাস্ফীতি আর হ্রাসের ধাক্কা সামলেছি। কালকেই যে সারা পৃথিবী ধ্বংস হবে না সে কথা দিতে পারিনা তবে জেঙ্গিস খান, হিটলার আর সন্ত্রাসবাদ সত্ত্বেও মানবসভ্যতার ধারা যে পাঁচহাজার বছর ধরে মোটামুটি ক্রমোন্নতির দিকে বইছে, এটা বুদ্ধিগোচর হচ্ছে। পেশার সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত থেকে ভালো দখল এসেছে বোধ হয়, অভিজ্ঞতা তো বটেই। যেমন অনেক প্রযুক্তিবিদ বলতে পারেন যে আজকের এই প্রযুক্তিময় কালে কোনো না কোনো প্রযুক্তির জন্মমুহূর্ত থেকে আমরা উপস্থিত আছি, আমাদের হাতে গড়া প্রযুক্তি আজ তরুণ, এবং হয়তো বা আমজনতার কিছু কাজে লাগছে। ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে, সংসারে ঢুকেছে, ভুলভাল নিশ্চয়ই করছে, কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-আনন্দের ভাগ পাচ্ছি বিশাল এক দায়বদ্ধতা না নিয়েই। গিন্নির সঙ্গে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেবার সুযোগ আছে এবং ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে এটি ভারী মধুর রূপ নিতে পারে। তর্কের চেয়ে আলোচনা ভালো লাগে, জীবনের অভিজ্ঞতা অভ্রান্ততার ভ্রান্ততা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ এনে দিয়েছে।

বার্ধক্যকে এই ভালো লাগা, এটা একদিনে হয় না, এর জন্য কিছু ভাবনায় সময় ব্যয় করতে হয়। ষাট থেকে পঁয়ষট্টি আছে এই ভাবনার জন্য। আমার মনে হয় এই সময়ে নিজের মনে, কর্মে, কৃতিতে একটা সার্চলাইট ফেলে তলিয়ে দেখা দরকার -- আত্মসমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণ। আমার বিশ্বাস যে আমরা যারা নেহাৎই ছাপোষা মানুষ, তলিয়ে খতিয়ান নিলে আমাদের জীবন খুব একটা অখাদ্য নয়। আমরা জীবনযুদ্ধে হয়তো পর্যুদস্ত হয়েছি, কিন্তু হাতিয়ার ফেলে পরাস্ত হইনি। ছোটোখাটো ভুল কাজ নিশ্চয় করেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

ছোটোখাটো ভালো কাজও করেছি। সংসার সামলেছি, ছেলেমেয়ে মানুষ করেছি, আইন মেনে চলেছি মোটামুটি, কিছু লোকের উপকার করেছি, তা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপার মতো না হলেই বা কী এসে গেলো। আর জীবনের এই মধ্যপর্বে পেরিয়ে আসার সময় আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী হয়েছে, বিচার আর বিশ্লেষণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই। এই বিশ্বাসটা আসা ভালো, এই এজলাসে বাদী বিবাদী দুপক্ষের কৌঁসুলী তো আমরা নিজেরাই বটে, বিচারকের আসনও অলঙ্কৃত করে আছি আমরা। বিচারান্তে দেখবো যে গেলাসের অর্ধেকের কাছাকাছি ভরা আছে, 'মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, . . . সুর তবু লেগেছিল বারেবার'।

এই আত্মসমীক্ষাটা করে নিলে তার পরের ধাপটা অতিক্রম করা একটু সহজ হয়। বার্ধক্যদিগ্‌গজেরা অবশ্য নানা জ্ঞানের কথা বলেন, পরহিতার্থে নিজেকে এবার উৎসর্গ করো, এমনধারা সব মহৎ কথা। কিন্তু আমার মনে হয় এই অন্ত্যপর্বে সবিশেষ স্বার্থপর হওয়াটায় দোষ নেই কোনো, হওয়াটাই উচিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন। এই স্বার্থপরতার প্রকাশ হতে পারে, 'যা আমার ভালো লাগে তাই করবো', 'যা আমার ভালো লাগে না তা করবো না' বা দুয়ের কোনো মাপের একটা সমাহারে। পরহিত যদি এর প্রথমটির মধ্যে পড়ে ভালো, না পড়লেও চলবে। জীবনের দুইতৃতীয়াংশ সংসারের তাগিদে আর তাড়ায় কাটিয়ে এসে বাকী সময়টা অন্তর্মুখী হলে পাল্লা কিছু একদিকে ঝুঁকে পড়বে না। 'আমি তোমার ভুবন মাঝে, লাগিনি নাথ কোনো কাজে' -- সবসময় নয়, শুধু শেষের এই কিছু দিন। যাঁরা অবসর নিচ্ছেন তাঁদের এই প্রস্তাবে ওপর ওপর খুব একটা আপত্তি থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কিন্তু মনে মনে মেনে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয় বলে আমার সন্দেহ আছে। আসলে এতো বছর, বিশেষ করে মধ্যপর্ব, সংসারে কাটিয়ে নিজের জন্য কিছু করার অভ্যাসটাই আমাদের চলে যায়। আমরা কোম্পানীর যাতে নাম হয় সে কাজ করি, পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার আনার জন্য কাজ করি, নিজেদের বঞ্চিত করি যাতে ছেলেমেয়েরা সুখী হয়, এই আর কী। তারপর অন্ত্যপর্বে আত্মসুখের কথাটা মেনে নিলেও কাজে পরিণত করতে গেলেই মন থেকে একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধটা তাড়ানো যায় না কিছুতেই।

এই সমস্যার কোনো রকমে সমাধান করা গেলেও বৃহত্তর সমস্যা এই যে আমাদের কী যে ভালো লাগবে তা আদৌ জানিনা বা বেমালুম ভুলে গেছি। হ্যাঁ, সকালে ঘড়ি ধরে উঠতে হবে না, ভীড় ঠেলে আপিস যেতে হবে না, আপিসে সায়েবের ঝাঁটা খেতে হবে না, এসব নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কিন্তু এ সবই নঞর্থক, না, না, না। দুর্ভাগ্যবশত নিজের ভালো লাগার এই হিসেব নেওয়াটা সহজসাধ্য নয়, চাই কী মাথার কিছু ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, কিছু চিন্তা বা শ্রমের মূলধন খসাতে হয়। ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হয়তো এই কর্মে ব্যয় করা যায়, কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগেরই সে কর্মে অনীহা। অবসর নেবার পরেও অবশ্য এই খোঁজ করা যায় না তা নয় তবে তখন মাথার কাছে বন্দুক ধরা, নতুন কিছু শুরু করে স্থিতু হবার সময়ের ঘাটতি, ঘাটতি উদ্যমেরও। যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বে কিছু বিনোদনের চেষ্টা করেছিলাম, সময়ের অভাবে তা ছেড়ে দিতে হয়েছে, সেসবের ধুলো ঝেড়ে দেখা যেতে পারে এখন আর ভালো লাগে কীনা। দাবা, ব্রিজ, গল্‌ফ। আমার এক মার্কিন বন্ধু বাইক চালানো শুরু করে এখন সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে যুগলে। বই পড়া বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নেশা রাতারাতি ধরানো যায় না। আমার এক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর বন্ধু এককালে ফিজিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতো। অবসর নিয়ে সে আদাজল খেয়ে লেগেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্‌স্ আর রিলেটিভিটির অন্তস্থলে প্রবেশ

করার জন্য, দস্তুরমতো কলম বাগিয়ে অঙ্কটঙ্ক কষে। ফিজিক্সের ভালোমন্দ তাতে কিছুই হবে না, কিন্তু মরার আগে সে নিজে একবার এই রহস্যের চাবিকাঠিটি হাতে ধরতে চায়। সফল হলে ভালো, না হলেই বা কার কী এসে গেলো, 'ভালো আমার লেগেছিল, রইলো সেই কথাই'।

ততঃ কিম্। আমি জানিনা। আমার অবসরজীবন সবে শুরু করেছি। দুয়েকটা বিষয়ে আগ্রহ ছিলো, -- ফিজিক্সের মতো মহতী কিছু নয় -- সারাজীবন তাতে তা দিয়ে এবার মনে হোলো সময় একেবারে ফুরিয়ে যাবার আগে তাদের মুক্তি দিয়ে দেখি কোথায় পৌঁছনো যায়। এরা কতোদিন টিঁকে থাকবে ? জানিনা। আদৌ থাকবে কি? জানিনা। যদি আর ভালো না লাগে তবে কী করবো? জানিনা। জীবনের কোনো যাত্রাই এর বেশী পাথেয় নিয়ে শুরু করিনি, টালমাটাল হয়ে সবসময়েই কোথাও না কোথাও পৌঁছে গেছি, এই আশ্বাস। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে যাঁরা আমাদের জ্যেষ্ঠ পথিকৃৎ তাঁরা কী বলেন?

আর কী? 'পূর্বাচলের পানে তাকাই, অস্তাচলের ধারে আসি'।

সুমিত রায়
নিউ জার্সি,২০০৫